অজানা শঙ্কা

অধিকারের নামে বিকৃতি প্রচার

আব্দুর রহমান আল হাসান

বাংলাদেশে সমকামিতা মতাদর্শ বিস্তার

কাদের পরিকল্পনায় এই বিকৃতি এই দেশে প্রবেশ করলো?

আব্দুর রহমান আল হাসান

www.arhasan.com

الرحلة
FOUNDATION

এই ছোট বইটি বিতরণের উদ্দেশ্য হলো, দ্বীনী দাওয়াহ্। আপনার আদরের সন্তান, আদরের ভাগিনা-ভাগিনী যেন এই কলঙ্কিত ও রুচিবহির্ভূত কার্যক্রমে যুক্ত না হয়। আমরা হয়তো ভাবছি, আমাদের সন্তানরা এই ফিতনায় পতিত হবে না। কিন্তু এটি এতটাই ভয়ঙ্কর ফিতনা, যার মধ্যে কে কখন কিভাবে পড়ে যাবে, নিজেও জানবে না। আগামী পৃথিবী ভয়ঙ্কর। যদি এখন থেকেই আমরা সতর্ক না হই তাহলে আমরা হয়তো আমাদের আদরের সন্তান, ভাই-বোন, নাতি-নাতনিদের খুঁজে পাব না।

আমরা তাদেরকে এমন এক জগতে দেখতে পাব, যা হবে অবিশ্বাস্য! আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে কারা এই বিকৃত আচরণ ও চিন্তাধারা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে, সেই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোকপাত করা হলো এই বইতে।

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের সময় থেকেই পৃথিবীতে আস্তে আস্তে নতুন নতুন কিছু ফিতনা আমদানি করা শুরু হয়। যেসব ফিতনা প্রাচীনকালে পৃথিবীতে থাকাবস্থায় স্রষ্টার পক্ষ হতে ধ্বংস নেমে এসেছিল।

তারপরও এসব ফিতনা ছড়ানো শুরু হলে এর সাথে সাথে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু, ভাইরাসও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

গত ৯০ দশকের সময়ে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা এবং রোল মডেল দেশগুলো এইডসে পৃথিবীর জন্য হুমকি স্বরুপ হিসেবে চিহ্নিত করে।

এইডস ভাইরাস নির্মূলের লক্ষ্যে তৈরি হয় নিত্য নতুন ঔষধ, টিকা ও আরো বহু গবেষণাকেন্দ্র। এইডস ভাইরাস মোকাবেলার জন্য সেই সময় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগ করে। ফান্ড দেয়।

এইডস মহামারি পৃথিবীতে এসেছে বিকৃত যৌনাচার ও সমকামিতা মতাদর্শ শুরু হওয়ার পর থেকেই। সেই সময় এইডস নিয়ে যেসব সংস্থা কাজ করতো, দেখা যেত, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারাও সমকামী অথবা সমকামী সংগঠনের সাথে জড়িত।

ফলস্বরূপ এইডস নির্মূলের জন্য দেওয়া ফান্ড চলে যায় সমকামিদের হাথে। আর সমকামী ব্যক্তিরা এই সমকামিতা মতাদর্শ বিস্তার ঘটানোর জন্য কোমর বেঁধে নামে।

তৎকালীন সময় পৃথিবীতে বহু জায়গায় সমকামিতা নিষিদ্ধ হলেও তারাও এইডস রোগ নির্মূলের জন্য ফান্ড দিত। তাই সমকামিরা এভাবেই বহু দেশ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেয়।

আস্তে আস্তে এই ধারা বাংলাদেশেও প্রবেশ করে। বাংলাদেশে সমকামিতা মতাদর্শ বিস্তার ঘটে শিবানন্দ খান ও ‘বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার’ এর হাত ধরে।

তবে এর আগে আরো বেশ কিছু এনজিও এই লক্ষ্যে বাংলাদেশে কাজ করে। উপমহাদেশে 'নায ফাউন্ডেশন' সমকামিতা বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করা শুরু করে শিবানন্দ খান এর হাত ধরে।

সে ভারতসহ বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে সমকামিতা প্রচারের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। এভাবেই একটি বৃহত্তম নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। শিবানন্দের সহায়তায় বাংলাদেশে সমকামী পুরুষদের যৌন স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৬ সালে 'বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার' যাত্রা শুরু করে।

সমকামিতা বিস্তারে 'বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার'

'বন্ধু'কে তখন সহায়তা করেছিল শিবানন্দের নায ফাউন্ডেশন। এছাড়াও আমরিকান একটি এনজিও 'ফ্যামিলি হেলথ ইন্টারন্যাশনাল' ও 'বন্ধু'কে সাহায্য করে। আর 'বন্ধু' জানায় ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে শিবানন্দ খান যেই জঘন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এসেছিল, এতে সহায়তা দেয় আমেরিকার 'ফোর্ড ফাউন্ডেশন'।

বাংলাদেশেও সেই সময় এই সমকামীদের মাধ্যমে এইডস রোগ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। যেহেতু 'বন্ধু' এইডস রোগ নির্মূলের সাইনবোর্ড লাগিয়ে এই সেক্টরে কাজ করছিল, তাই তারা বাংলাদেশ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করার সুযোগ পায়।

পরবর্তীতে 'বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার' USAID, নেদারল্যান্ড দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ থেকে তাদের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য ফান্ড পায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের কার্যক্রম সহজেই ছড়িয়ে পড়ে।

'বন্ধু' তখন সমকামী পুরুষদের জন্য ডিএইসি নামে স্টপ ক্লিনিক খোলে। তারা তখন সমকামী পুরুষদের নিকট বিভিন্ন যৌন টুলস বিতরণ করে। পাশাপাশি সমকামীরা যেন সহজেই যৌন সঙ্গী খুঁজে পায়, তাই একটি নেটওয়ার্কও তৈরি করে তারা।

অর্থাৎ তারা ছদ্মবেশে চিকিৎসা সেবার নামে সমাজে বিকৃত ও নিষিদ্ধ যৌনাচার বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করা শুরু করে। পরবর্তীতে ২০০০ সাল থেকে 'কেয়ার বাংলাদেশ' ও 'বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার' হিজড়াদেরকে নিয়েও কাজ করা শুরু করে।

২০০৭ সালে বাংলাদেশে সমকামিতা মতাদর্শ বিস্তার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যেন আইনি ঝামেলায় না পড়ে, তাই উকিলদের একটি গ্রুপ তৈরি করে 'বন্ধু'। তাদের এই উকিল ক্রয় করার টাকা আসে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে। 'শেষ তথ্যমতে, ৩০ টির ও বেশি জেলায় 'বন্ধু' তাদের সমকামিতা মতাদর্শ বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

এভাবেই পশ্চিমাবিশ্বের সহায়তায় ও দেশীয় কু-চক্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের রক্ষণশীল সামাজিক ব্যবস্থা নষ্ট করতে বিভিন্ন এনজিও এবং তাদের দোসররা কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে সমকামিতা মতাদর্শ বিস্তার শুরু হওয়ার প্রথম ১০ বছর তারা 'এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য সেবা' ব্যানারের আড়ালে কাজ করে। ২০০৭ সালের পরে তারা ভিন্নভাবে তাদের প্ল্যান অগ্রসর করে। তারা তখন সমকামীদের 'যৌন সংখ্যালঘু' হিসেবে উপস্থাপন করে তাদের 'যৌন অধিকার' নিয়ে তারা কার্যক্রম শুরু করে।

এলজিবিটি আন্দোলন বাস্তবায়নে নতুন মোড়

বাংলাদেশে নতুন এই ষড়যন্ত্র করা এবং সাহস যোগানোর পেছনে কাজ করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ। এই বিষয়ে তারা বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশ করে। যা লিখেছিল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ এর শিক্ষক ও গবেষকরা।

তাদের ভাষ্যনুযায়ী, ২০০৫ সালে সমকামী অধিকার নিয়ে যুক্তরাজ্যে এক গবেষণা কনসোর্টিয়ামে অংশগ্রহণ করার পর বাংলাদেশেও এই বিকৃত চিন্তা বাস্তবায়ের উদ্যোগ নিতে আগ্রহী হয় তারা। এরপর ২০০৭ সাল থেকে ব্র্যাক বিভিন্ন মিটিং, ওয়ার্কশপ এবং মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে শুরু করে।

সেখানে তারা সমকামিতা ও বিকৃত যৌনাচারকে সামাজিকরণ করতে এর নাম দেয় "যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার" নিশ্চিতকরণ প্রচেষ্টা। ব্রাকের প্রথম ওয়ার্কশপের ফান্ডিং দেয় ব্রিটেনের "DFID" (Department for International Development)।

প্রথম এই ওয়ার্কশপের সাফল্য থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছয় মাস পর ২০০৭ এর জুলাইতে ব্রাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথের উদ্যোগে 'জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি' নামে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়।

উক্ত কনফারেন্সে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক, কেনিয়া ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সমকামী বক্তা ও অ্যাক্টিভিস্ট অংশগ্রহণ করে। সেখানে তারা সমকামীদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসহ এলজিবিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে।

উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বিভিন্ন এনজিও, ফেমিনিস্ট গ্রুপ ও সমকামী গ্রুপের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। এমনকি দেশের সরকারি কিছু ব্যক্তিরাও ব্রাকের সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

এই কনফারেন্স শেষ হওয়ার পর "ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন" নামে একটি এনজিও ব্রাকের সাথে যোগাযোগ করে জানায়, তারা বাংলাদেশে সমকামিতা নিয়ে কার্যক্রমগুলোতে অনুদান দিতে আগ্রহী। ব্যস, বিদেশী ডলার পেয়ে সমাজ নষ্ট করার আরো উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্র্যাক।

নতুন মোড়কে ব্র্যাক

ব্র্যাক ২০০৭ এ এসব কার্যক্রম করার পর ২০০৮ এবং ২০০৯ তে আরো বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা তখন তাদের কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন ধরণের গ্রুপ তৈরি করে।

১. একটি গ্রুপ ছিল ঢাকার বাহিরের অ্যাকাডেমিকদের নিয়ে। তাদের মাধ্যমে সমকামিতা ছড়ানো এবং কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মস্তিষ্কে বিষ প্রবেশ করানোর কার্যক্রম শুরু করা হয়।
২. আরেকটি গ্রুপ ছিল সাংবাদিক ও বিজ্ঞাপন সংস্থাকে নিয়ে। তাদের মাধ্যমে যৌনতা নিয়ে লেখালেখি ও বিজ্ঞাপনে যৌন সুড়সুড়ি উপস্থাপনা নিয়ে কাজ করা শুরু হয়।

৩. শেষ গ্রুপটি হলো সমকামী সম্প্রদায়। তাদের অধিকার নিয়ে কাজ করা এবং এজেন্ডা গঠন, প্রশিক্ষণ ও আরো বিভিন্ন যৌন বিকৃতি নিয়ে কাজ শেখানো হয়।

ব্রাকের উপরোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশে সমকামিতা মতাদর্শ বিস্তার ঘটে খুব তাড়াতাড়ি। ব্র্যাক এখানে কৌশলে সরাসরি সমকামিতা শব্দ ব্যবহার না করে 'যৌন অধিকার', 'যৌন শিক্ষা' নামে কার্যক্রম চালায়।

তারা বিভিন্ন স্টকহোল্ডার, পলিসিমেকারদের নিজেদের দলে আনতে সক্ষম হয়। আস্তে আস্তে তারা গবেষণার নামে আরো কৌশলে সমকামিতা মতাদর্শ সামনে আনার চেষ্টা করে। তাদের এই কার্যক্রম ছিল অধিকাংশই সফল।

ব্র্যাক নিজেরাই নিজেদের সাফল্যগুলো বর্ণনা করেছে। এই বিষয়ে তারা তাদের ডকুমেন্টরিতে বলে,

১. ব্রাকের এই উদ্যোগের ফলে বিভিন্ন মানুষকে একত্রিত করা সম্ভব হয়েছে। তারা তাদের অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে প্রভাবিত করতে পারবে। এতে 'যৌনতা এবং অধিকার' তথা সমকামিতার সমর্থনের ভিত্তি আরো মজবুত হয়েছে।
২. ব্রাকের উপরোক্ত উদ্যোগের ফলে মিডিয়া, সমকামী ব্যক্তিরা, সমকামী সমর্থক ও গবেষকদের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন আয়োজনে তাদেরকে এক টেবিলে বসার সুযোগ দিচ্ছে ব্র্যাক।
৩. এই উদ্যোগের ফলে গণমানুষের মাঝে বিকৃত এই সমকামিতা সম্পর্কে আরো স্বাভাবিকভাবে আলোচনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মানুষ অন্যভাবে ভাবতে শিখেছে।

বাংলাদেশের মতো সম্রান্ত একটি রাষ্ট্রে কৌশলে এমন বিষ প্রবেশ করানোর জন্য ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশী প্রভূদের স্বীকৃতি লাভ করে। ২০২৩ সালে ইহুদি বিলিয়োনিয়ার জর্জ সরোস এর 'ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন' ১ বিলিয়ন ডলার পৃথিবীর ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়ার জন্য ঘোষণা করে। তাদের মধ্যে একটি ছিল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্র্যাকের এমন ধ্বংসাত্মক উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশে সমকামিতা মতাদর্শ বিস্তার ঘটতে থাকে। 'বন্ধু' ও তখন ব্র্যাকের সিলেবাস অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার পথে যুক্ত হয়। আস্তে আস্তে বিভিন্ন সমকামী সংগঠন দেশে প্রতিষ্ঠা হয়।

অনলাইন প্রচারণায় সমকামী অ্যাক্টিভিস্টরা

বাংলাদেশে ইন্টারনেট যাত্রার সূচনা থেকেই বিভিন্ন চ্যাট গ্রুপ, মেইল গ্রুপ এবং ফোরাম থেকে সমকামীদের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে। তারা এসব প্লাটফর্মে নিজে যৌন সঙ্গী খুঁজে বের করতো।

১৯৯৯ সালে রেঙ্গু নামে একজন 'গে বাংলাদেশ' নামে একটি অনলাইন গ্রুপ তৈরি করে। এটি ছিল বাংলাদেশে এই বিকৃত ধারার প্রথম গ্রুপ। রেঙ্গু ২০০৪ সালে মারা যাওয়ার পর তার গ্রুপের কার্যক্রম সেখানেই সমাপ্ত হয়।

এদিকে এই গ্রুপের কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০০২ সালে গড়ে উঠে 'বয়েস অফ বাংলাদেশ – বব'। এটি ইয়াহু চ্যাটে গ্রুপ চালু করে। অনলাইনের পাশাপাশি তারা অফলাইনে 'গেট টুগেদার' এবং 'ডিজে পার্টি'র আয়োজন করতে শুরু করে।

এই অনুষ্ঠানগুলো ছিল সমকামী যৌন সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার মাধ্যম। 'বব' এর সদস্যরা ছিল বেশিরভাগ ঢাকার। তাই তাদের কার্যক্রম ছিল ঢাকাতে। ওদিকে 'বন্ধু' কাজ করতে গ্রামাঞ্চলে, নিম্নবিত্তদের বা মধ্যবিত্তদের মধ্যে।

২০০৫ সালে 'বন্ধু'র সাথে যুক্ত হয় 'বয়েস অব বাংলাদেশ'। ২০০৭ সালে 'বব' ব্র্যাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে।

এটি তাদের চিন্তায় পরিবর্তন ঘটায়। তারা তখন তাদের কাজকে ভিন্নভাবে পরিচালনা করার জন্য উদ্যোগ নেয়। আস্তে আস্তে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সাথে তাদের সখ্যতা গড়ে উঠে।

ব্র্যাকের ওয়ার্কশপের পর ‘বব’ প্রকাশ্যে LGBTQ এর প্রতীক টাঙ্গিয়ে ধানমন্ডির জার্মান ইন্সটিটিউটের ছাদের ক্যাফেতে তারা অনুষ্ঠান করে ২০০৮ সালে। এটা ছিল বাংলাদেশে সমকামীদের প্রকাশ্য অনুষ্ঠান।

২০০৯ সালে ‘বব’ কক্সবাজারে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। এটি ছিল বাংলাদেশে সমকামী সংগঠনের আয়োজিত প্রথম ওয়ার্কশপ। তাদের এই ওয়ার্কশপে ফান্ড দেয় নরওয়ের ‘LLH’। এই ওয়ার্কশপে সমকামীদের পাশাপাশি হিজড়া সম্প্রদায়ও অংশগ্রহণ করে। এই ওয়ার্কশপে তারা দুইটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১. বিকৃত যৌনতার বৈধতা আদায় করার জন্য একটি জোট গঠন।
২. বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা বাতিলের জন্য কাজ করা

দণ্ডবিধি ৩৭৭ ধারা নিয়ে আপত্তি

বাংলাদেশের দণ্ডবিধি ৩৭৭ ধারাতে বলা আছে,

কোনো ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কোনো পুরুষ, নারী অথবা পশুর সাথে নিয়ম বহির্ভূত যৌন সঙ্গম করে তাহলে তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হবে অথবা অপরাধের ধরণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়কাল কারাগারে থাকতে হবে। যা দশ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে এবং এর সাথে তাকে নির্দিষ্ট অংকের জরিমানাও প্রদান করতে হবে।

‘বব’ এর কার্যক্রমের পর ২০০৯ সালে জাতিসঙ্ঘ থেকে ৩৭৭ ধারা বাতিলের জন্য সুপারিশ করা হয়। জাতিসংঘে এই সুপারিশ তোলা এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে সেখানে প্রতিবেদন তৈরিকে ভূমিকা রাখে ‘SRI’ নামে আন্তর্জাতিক একটি এনজিও। আর SRI কে সহায়তা করে ‘বব’।

তখন পর্যন্ত ‘বয়েজ অব বাংলাদেশ – বব’ একটি অনিবন্ধিত সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। ২০১০ সালে বইমেলায় সমকমিতা নামে একটি বই প্রকাশ করে ইসলামবিদ্বেষী অভিজিৎ রায়। সে তাতে উল্টাপাল্টা থিউরি ও বিজ্ঞান বহির্ভূত তথ্য নিয়ে সমকামিতাকে স্বাভাবিকরণের ব্যর্থ চেষ্টা করে।

২০১০ সালে কুখ্যাত এই অভিজিৎ রায়ের 'সমকামিতা' বইয়ের রিভিউ প্রকাশ করে 'প্রথম আলো'। এতে দেশের বহু মানুষ সমকামিতার নষ্টামি সম্পর্কে জানতে পারে এবং বইটি মানুষ সংগ্রহ করে।

২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক LGBTQ এর সাথে পুরোপুরি যুক্ত হয় 'বব'। এবছর আবার ৩৭৭ ধারাকে বাতিলের জন্য জাতিসঙ্ঘ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে বলা হয়। সরকার এটি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে।

বাংলাদেশ সরকার বলে, দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সাথে এই সুপারিশ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সমকামী সংগঠন ও তাদের দোসর এবং মিডিয়া সরকারের এই কঠোর অবস্থানের সমালোচনা করে। পরবর্তীতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ ও 'বব' যৌথভাবে গোলটেবিল বৈঠক করে। তারা বাংলাদেশে সমকামিতা মতাদর্শ বিস্তার ঘটানোর প্ল্যান নিয়ে আলাপ আলোচনা করে।

২০১৪ সালে বাংলাদেশের সমকামীদের সামাজিকীকরণের জন্য মার্কিন সরকারের স্টেট ডিপার্টমেন্টের অর্থায়নে 'প্রজেক্ট ধী' নাম দিয়ে একটি প্রকল্প শুরু করে বয়েস অব বাংলাদেশ-'বব'।

পরবর্তীতে অক্টোবরে 'ধী' নামে একটি কমিক বের করে 'বব'। সেখানে প্রধান চরিত্র ছিল একটি সমকামী নারী। এই কমিকের মোড়ক উন্মোচন করে ব্রিটিশ কাউন্সিল অফিসে। ডেইলি স্টার এটি নিয়ে ইতিবাচকভাবে নিউজ প্রকাশ করে।

ব্র্যাকের অনুপ্রেরণায় আরো কিছু সমকামী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ২০০৭ সালে সমকামীদের নিয়ে সেমিনার করার পর আরো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ২০০৮ সালে 'কুইয়ার বাংলা' এবং 'গে বাংলা' নামে দুটি সংগঠন তৈরি হয়। যদিও এগুলো কিছুদিন পর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

কিন্তু ২০১১ সাল থেকে নেটওয়ার্কিং শুরু করে ২০১৪ সালে ম্যাগাজিন হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয় 'রূপবান' নামে সমকামীদের পত্রিকা। এই ম্যাগাজিনে স্পন্সর করে ডেইলি

স্টার পত্রিকা। 'রূপবান'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তখন ব্রিটিশ হাই কমিশনার উপস্থিত হয়।

ডেইলি স্টার এই খবর তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করে। এর পাশাপাশি বাংলা ট্রিবিউন, ঢাকা ট্রিবিউন, বিবিসি সহ আরো কিছু সংবাদ মাধ্যম এই 'রূপবান' এর কথা প্রকাশ করে। এই উদ্যোগের পুরো ফান্ডিং আসে পশ্চিমা থেকে।

২০১৪ ও ২০১৫ সালে 'রূপবান' পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে শাহবাগে সমকামী এবং হিজড়াদের নিয়ে র‍্যালি করে।

বাংলাদেশে সমকামিতা মতাদর্শ বিস্তার করতে খোলস পরিবর্তন

২০১৫ সালের দিকে আমেরিকায় সমকামিতা বিয়ে বৈধ হয়ে যাওয়ার পর ধনকুবেরা সমকামিতার মধ্যে ফান্ডিং দেওয়া কমিয়ে দেয়। তারা তখন নব্য ভাইরাস ট্রান্সজেন্ডার প্রমোট করতে ফান্ড দিতে থাকে।

এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে চলমান LGBTQ সংগঠনগুলো বুঝতে পারে, এভাবে প্রকাশ্যে সমকামিতা প্রমোট করলে দেশের সাধারণ জনগণ কখনোই মেনে নিবে না। তাই তারা কৌশল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা তখন ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ ও যৌন শিক্ষার আড়ালে নিজেদের কার্যক্রম শুরু করে।

ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে কার্যক্রমের আরেকটি কারণ ছিল, হিজড়া সম্প্রদায়কে দেশের মানুষ অবহেলিত সম্প্রদায় বলে সহানুভূতি প্রদর্শন করে। আর ট্রান্সজেন্ডার আর হিজড়াকে একত্রিকরণের ষড়যন্ত্র পশ্চিমাবিশ্ব থেকে আগে থেকেই শুরু হয়। তাই হিজড়াদের আড়ালে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে সামনে আনে সমকামী সংগঠনগুলো।

হিজড়া শব্দ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ২০১৫ সালে ঘটে বিপত্তি। এই বছর হিজড়াদের সমাজের অংশ হিসেবে সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ে কেরানী বা অফিস সহকারী হিসেবে চাকুরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৪ হন হিজড়াকে বাছাই করে। ২জন চট্টগ্রামে আর ১০ জন ঢাকায়। প্রাথমিক মেডিকেল টেস্ট করার পর যেন থলের বিড়াল বেরিয়ে আসে।

তাদের ১২ জনের মধ্যে ১১ জনেরই লিঙ্গ এবং অন্ডকোষ আছে। তারা সুস্থ-স্বাভাবিক পুরুষ। আর এই টেস্টের দুই বছর আগে ২ জন স্বেচ্ছায় নিজের লিঙ্গ সার্জারি করে অণ্ডকোষ কেটে ফেলেছে। এরপর উক্ত ১২ জনকেই বাদ দেওয়া হয়।

এতে সমকামী সংগঠনগুলো পড়ে যায় বিপদে। তারা তখন নতুন দাবী করতে থাকে।

১. হিজড়া সনাক্তকরণ পরীক্ষা বাতিল করতে হবে।
২. হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডার একই জিনিষ। আর উভয়টার জন্য একই শব্দ ব্যবহার শুরু করে।

সমকামী সংগঠনগুলোর দাবী, শারিরিক পরীক্ষার মাধ্যমে নাকি যৌন হয়রানী হচ্ছে। অথচ বিভিন্ন কলেজ, ইউনিভার্সিটি, প্রবাসীদের শারিরিক পরীক্ষা দিতে হয়। সমস্যা কেবল হিজড়াদের ক্ষেত্রেই?

বাংলাদেশে সমকামিতা মতাদর্শ বিস্তার করতে ট্রান্সজেন্ডার শব্দ ব্যবহার

দেশে ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন পাশ করার জন্য ব্র্যাক, 'বন্ধু'সহ আরো অনেকেই চেষ্টা করছে। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে খবরে বলা হয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জাহাঙ্গীর আলম বলে, আমরা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার আইনের খসড়া তৈরি করতে পেরে খুশী। এই কমিউনিটির সদস্যদের সমাজের মূলধারায় আনা আমাদের মূল লক্ষ্য। সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করছে।

এছাড়াও ট্রান্সজেন্ডার আইন ২০২৪ এর ডিসেম্বরের মধ্যে পাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে উল্লেখ করেন সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ের সচিব খায়রুল আলম শেখ। বাংলাদেশে সমকামিতা মতাদর্শ বিস্তার করার জন্য ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুকে সামনে আনা হয়।

আমেরিকার ফ্লোরিডা রাজ্যের রিপাবলিকান গভর্নর 'রন ডিস্যান্টিস' ২০২৪ এর জানুয়ারীতে মার্কিন সরকারের ব্যাপারে বলেছেন, 'USAid' এর মাধ্যমে বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রচারে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করেছে। এটা আমেরিকার জনগণের ট্যাক্সের টাকার অপচয়। তবে CNN বলছে, এটা শুরু হয়েছিল ২০১৮ তে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে।

বাংলাদেশে ইউএসএইডের দেওয়া ফান্ডের দ্বারা ট্রান্সজেন্ডার খসড়া আইন তৈরি করা হয়েছে। আর এই কাজটার দায়িত্ব পেয়েছে ‘বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার’। বাংলাদেশে এখন এই বিকৃত যৌনাচার ও সমকামিতার অন্যরুপ ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ শিশুদের পাঠ্যপুস্তকেও প্রবেশ করানো হয়েছে।

`NCTB’ এর ২০২৩ সালে সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যবইতে ‘শরীফার গল্প’ শিরোনামে স্পষ্ট ইসলাম বিরোধী ও সভ্যতা বিরোধী মতাদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানসিক সমস্যাকে তারা আনন্দের বিষয় হিসেবে উপভোগ করা শেখাচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের।

প্রবল প্রতিবাদের মুখে যদিও ২০২৪ সালে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবার আরেক ধাপ অগ্রসর হয়ে হিজড়া শব্দ ব্যবহার করেছে এই সমকামীরা। বাংলাদেশের পাঠ্যবইতে এই বিকৃত মতবাদ আনার পেছনে কাজ করেছে ‘বন্ধু’।

তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সাল থেকে NCTB এর সাথে কাজ করে আসছে এই ‘বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার’। এভাবেই যৌন শিক্ষার আড়ালে শেখানো হচ্ছে বিকৃত ও সভ্যতা বিরোধী যৌনাচার। সমকামিতা, লেসবিয়ান, গে এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট চিন্তা-ভাবনা।

ট্রান্সজেন্ডার হলো একটি মানসিক সমস্যা। পৃথিবীর কোনো ধর্ম এটিকে সমর্থন করে না। বর্তমানে যারা ই ট্রান্সজেন্ডার, তারাই সমকামী।

সমকামীতা প্রচারের সাইবোর্ড হিসেবে ট্রান্সজেন্ডার ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্ট যারা, তারা সকলেই কোনো না কোনো সমকামী গ্রুপের সদস্য।

তথ্যসুত্র

উপরোক্ত লেখাটি হলো, আসিফ আদনান ভাইয়ের নিচের ৬টি লেখার সংক্ষিপ্ত রূপ। লেখাগুলোর শিরোনাম,

এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যসেবা থেকে অধিকার এবং যৌন অধিকার, যৌন সংখ্যালঘু, যৌন বৈচিত্র্য

প্রকাশ্যে এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসম

ট্র্যান্সজেন্ডার ও হিজড়া

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ: আইন, পাঠ্যপুস্তক এবং যৌন শিক্ষা

বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডার নেপথ্যে কারা?

উপরোক্ত লেখাগুলো বিস্তারিত আকারে অনলাইনে পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। লিংক: https://chintaporadh.com/behind-the-curtain

লিংক টাইপ করতে সমস্যা হলে এই QR Code টি স্ক্যান করুন

কিছু সংযুক্তি

সমকামীদের নিয়ে বিশ্বে বড় বড় প্লাটফর্ম আছে। যেখানে এটি LGBT নামে পরিচিত। এই অক্ষরগুলোর ফুল মিনিং দেখলেই এটি পরিষ্কার হয়ে যায়।

L = Lesbian তথা যেই নারী অপর নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় ও দৈহিক কাম চরিতার্যে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ সমকামী নারী।

G = Gay তথা যেই পুরুষ অপর পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও দৈহিক কাম চরিতার্যে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ সমকামী পুরুষ।

B = Bisexual তথা যেই পুরুষ অপর পুরুষের প্রতি বা নারীর প্রতি অথবা যেই নারী অপর নারীর প্রতি বা পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ উভকামী।

T = Transgender তথা যেই পুরুষ নারী সাজে বা নারী দাবী করে বা যেই নারী পুরুষ সাজে বা পুরুষ দাবী করে।

এই বিষয়গুলো দেখলে কারো কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়, ট্রান্সজেন্ডার কি? এর মিশন-ভিশন কি?

ট্রান্সজেন্ডার বলা হয়, রুপান্তরকামীকে। অর্থাৎ মানুষের জন্মগত জেন্ডার (পুরুষ বা মহিলা) পরিচয়কে বাদ দিয়ে নিজের মতো জেন্ডার নির্ধারণ করা।

আর হিজড়া হলো একটি জন্মগত জেনেটিক সমস্যা। হিজড়া কিভাবে হয়? এমন প্রশ্নের জবাবে চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে, জন্মের সময় অ্যান্ড্রোজেন রিসিপ্টর নামক একটি জিনে পরিবর্তনের কারণে পুরুষদের হরমোন তৈরিতে বাধাগ্রস্ত হয়। যে কারণে তারা জেনেটিক্যালি তথা জন্মগতভাবে পুরুষ হয়েও বাহ্যিকভাবে দেখা যায় মেয়েদের মতো। প্রতি ৫ হাজার শিশুর মধ্যে ১ জন এমন হতে পারে।

এছাড়াও আরো বেশ কিছু কারণে হিজড়া হতে পারে। কিছু ধরন আছে যেগুলো বয়ঃসন্ধির আগে বুঝা যায় না। হিজড়া খুবই অস্বাভাবিক একটি ঘটনা। শিশুজন্মের মাত্র ০.০১৮% ক্ষেত্রে হিজড়া নামক সমস্যা দেখা দিতে পারে। বাকী ৯৯.৯৮% ক্ষেত্রে শিশুরা জন্মগতভাবে ছেলে বা মেয়ে হিসেবে জন্মগ্রহণ করে।

~

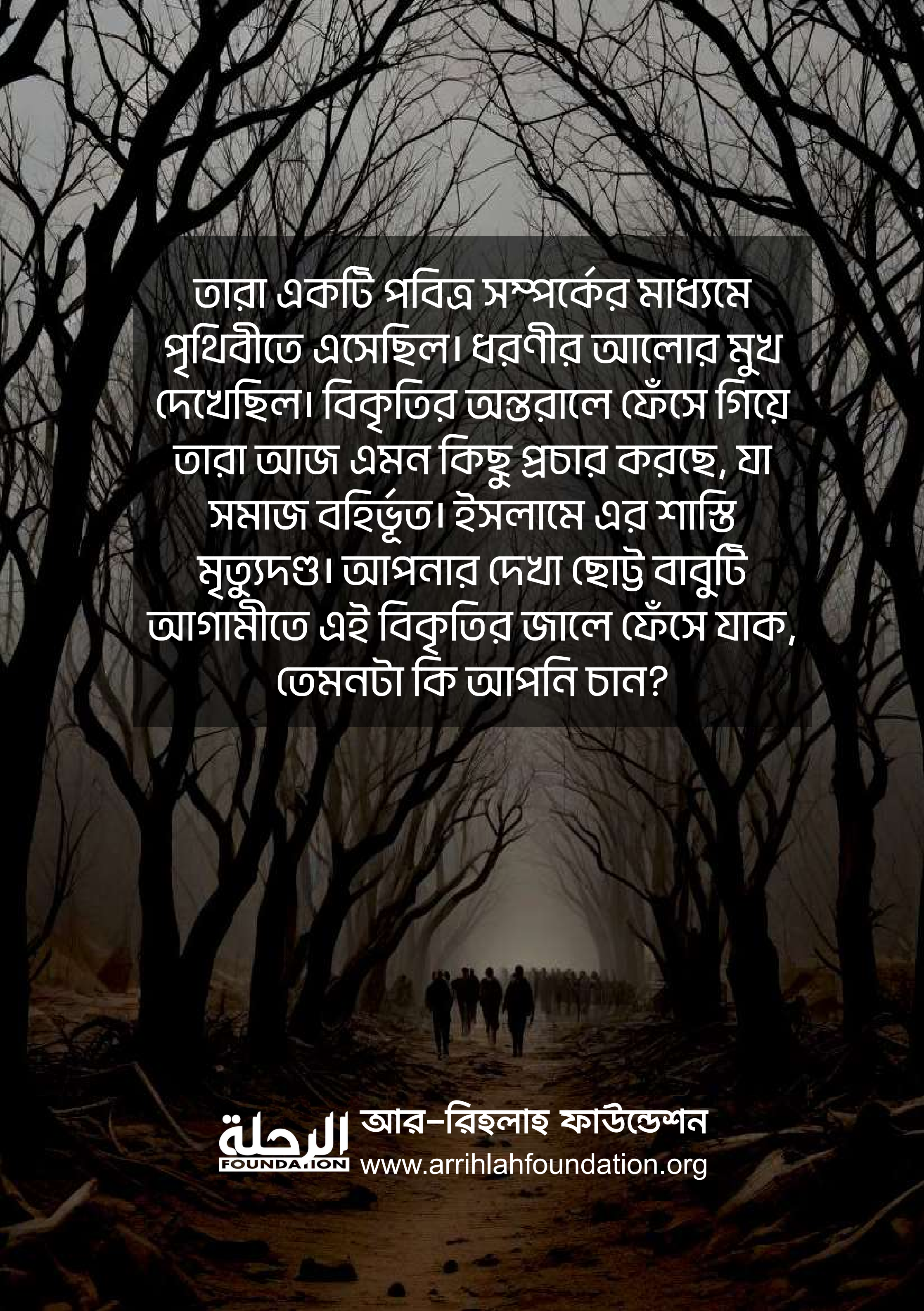
তারা একটি পবিত্র সম্পর্কের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছিল। ধরণীর আলোর মুখ দেখেছিল। বিকৃতির অন্তরালে ফেঁসে গিয়ে তারা আজ এমন কিছু প্রচার করছে, যা সমাজ বহির্ভূত। ইসলামে এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আপনার দেখা ছোট্ট বাবুটি আগামীতে এই বিকৃতির জালে ফেঁসে যাক, তেমনটা কি আপনি চান?
আর-রিহলাহ ফাউন্ডেশন
www.arrihlahfoundation.org